শকুন্তলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শকুন্তলা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হিন্দুত্ববুক্স
https://hindutvabooks.com
https://facebook.com/hindupustakkendra
https://twitter.com/hindutvabooks
mailto:hindutvabooks@gmail.com

শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তা'তে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্ব্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির, আয়নার মত; তা'তে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখীর ছায়া—সকলি দেখা যে'ত। আর দেখা যে'ত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তা'তে অনেক জীব জন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখী, কত টীয়াপাখীর ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণ-শিশু, কুশের বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বৎসরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল,পরনে বাকল ছিল,গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কৎকগুলি ঋষিকুমার।

তা'রা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত। আর কী করত?—বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধ'লো গাই মাঠে চরাতে যে'ত। সবুজ মাঠ ছিল তা'তে গাই বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তা'তে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তা'দের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটী ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশী ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধকথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মাণিক—ছোট মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিসুতি রাতে আপ্সরী মেনকা তা'র রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখীরা তা'কে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখীদেরও দয়ামায়া আছে কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হ'ল!

খুব ভোর বেলায় তপোবনের যত ঋষি-কুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তা'রা আমলকীর বনে আমলকী, হরীতকীর বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তার পরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে পাখীদের মাঝে ফুলের মত সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তা'কে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখী, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে। শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটীরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল। তার পর শকুন্তলার যখন বয়স হ'ল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তা'কে পর করলে, কিন্তু যা'রা পর ছিল তা'রা তা'র আপনার, হল। তাতঃ কণ্ব তা'র আপনার, মা-গৌতমী তা'র আপনার, ঋষিবালকেরা তা'র আপনার ভায়ের মতো, গোয়ালের গাই বাছুর—সেও তা'র আপনার, এমন কি—বনের লতাপাতা তা'রাও তা'র আপনার ছিল। আর ছিল—তা'র বড়ই আপনার দুই প্রিয়সখী—অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণ-শিশু—বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল।

তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ, ঘরের কাজ, অতিথি সেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকা লতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তা'রা প্রতিদিন মাধবী-লতায় জল দিত আর ভাব্‌ত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আস্‌বে।

এ ছাড়া আর কি কাজ ছিল?—হরিণ-শিশুর মত নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মত লতা-বিতানে গুণ গুণ গল্প করা, নয়তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসান; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মত তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা,—এই কাজ।

একদিন দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

দুষ্মন্ত

যে দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত। সেকালে এতবড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পূব দেশের রাজা, পশ্চিম দেশের রাজা, উত্তর দেশের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত-সমুদ্র তের-নদী—সব তাঁ'র রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা—রাজা দুষ্মন্ত। তাঁ'র কত সৈন্য সামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়ি খানায় কত সোনা রূপার রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁ'র সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল সেই দিন সাত-সমুদ্র তের-নদীর রাজা—রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—"চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।" মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল থাল লুচি মণ্ডা, ভার ভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠান্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হ'য়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল। 'না' বলবার যো কি, রাজার আজ্ঞা! অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্ষা হাতে শীকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথী রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শীকারে চল্লেন। দুপাশে দুই রাজহস্তি চামর ঢোলাতে চল্লো, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চল্লো, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চল্লো, আর সর্ব্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হট্‌হট্ করে চল্লেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষ মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্য সামন্ত বন ঘিরতে লাগল, বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখী, কত পাখীর ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মত ছোট ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সারা পেয়ে, বাসা ফেলে কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল। মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠান্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দ'লে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্ব্বতে সিংহ গর্জ্জন করে উঠল,সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখী, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ জালে ধরা ,পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার, পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমীর জল দিয়ে, আকাশের পাখী আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখীর সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চল্লো, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে

দৌড়েছে, সোনার রথ তা'র পাছে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্য সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চল্লো।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টীয়াপাখী লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল; আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুন্‌গুন্ গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণ-শিশু ও সিংহ-শাবক এক বনে খেলা করে। এ বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ ঊর্দ্ধশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশর ফেলে ঋষিদর্শনে চল্লেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা,—দুজনে দেখা হ'ল!

এদিকে মাধব্য কী বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ নাহলে তা'র চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পাল্‌কী ছাড়া সে এক পা চলে না, তা'র কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ান পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তা'র তৃষ্ণা ভাঙ্গে? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তা'র কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তা'র কি ঘুম হয়? বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুস্কিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্ব্বদা ভয়—ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে। রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—"মহারাজ, রাজ্য ছারেখারে যায়, শরীর মাটী হ'ল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।" রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করেছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্য সামন্ত সঙ্গে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে "হা শকুন্তলা যো শকুন্তলা!" ব'লে ফিরছে। হাতের ধনুক,তূণের বাণ কোন্ বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোণার অঙ্গ কালি হোয়েছে। দেশের রাজা বনে ফিরছে!

আর শকুন্তলা কী করছে?—নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তা'র মন কেমন হ'ল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চক্ষের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তা'কে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে—এইবার ভোর হ'ল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কি হ'ল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হ'ল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখী ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হ'ল?—

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কি হ'ল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দুজনে মালা বদল হ'ল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।

তারপর কী হ'ল?—

তারপর কতদিন পরে সোণার সাঁঝে সোণার রথ রাজাকে রাজ্যে নিয়ে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে ঘরে নিয়ে গেল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুন্‌তে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটী শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—সুন্দরি, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোণার রথ তোমাকে নিতে আসবে।"

কিন্তু হায়, সোণার রথ কই এল ?

কত দিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোণার রথ কই এল! হায় হায়, সোণার সাঁঝে সোণার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না!

পৃথিবীর রাজা সোণার সিংহাসনে, আর বনের রাণী কুটীর দুয়ারে,—দুই জনে দুই খানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙ্গে পড়্‌ল। কোথা রইল অতিথিসেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটীর দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না? কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটীর দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্ব্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায় কথায় যা'কে তা'কে ভস্ম করে ফেলেন, তা'র উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁ'কে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না।

দুর্ব্বাসার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুণ ছুটল, রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বললেন—"কি অতিথির অপমান? পাপীয়সি, এই অভিশম্পাত করছি—যা'র জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।"

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল—যে দেখবে কে এল কে গেল! দুর্ব্বাসার একটি কথাও তা'র কাণে গেল না। মহামানী মহর্ষি দুর্ব্বাসা ঘোর অভিশম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটীর দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্ব্বাসার পায়ে লুঠিয়ে পড়্‌ল। কত সাধ্য সাধনা করে, কত কাকুতি মিনতি করে, কত হাতে পায়ে ধরে দুর্ব্বাসাকে শান্ত করলে। শেষ এই শাপান্ত হ'ল—"রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে আংটী দিয়ে গেছেন সেই আংটী যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যত দিন সেই আংটী রাজার হাতে না পরবে ততদিন রাজা সব ভূলে থাকবেন।" দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন। বনপথে সোণার রথ আর ফিরে এল না।

এদিকে দুর্ব্বাসাও চলে গেলেন আর তাতঃ কণ্ব তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তা'র গলায় মালা দিয়েছেন। তাতঃ কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটীতে মিশে ছিল, তা'কে কত আদর করলেন, কত আশীর্ব্বাদ করলেন!

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চল্লো, তখন তা'দের আর আহ্লাদের সীমা রইল না! প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধফুলের তেল নিলে। দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল।

তা'র মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আল্‌তা দিলে, নতুন বাকল দিলে;—তবু ত মন উঠল না? সখীর এ কি বেশ করে দিলে?

প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রাণী, তা'র কি এই সাজ? হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?—হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোণার মল কোথায়? পরণে সাড়ী কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোণার সাড়ী উড়ে পড়ল, হাতের বালা খসে পড়ল, মতির মালা ঝরে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারাণীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হ'ল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোন দিকে যাবে,—সোণার পুরীতে রাণীর মত রাজার কাছে চলে যাবে—না—তিন সখীতে বনপথে আজন্ম—কালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বহে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণ-শিশু সোণার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। এক দণ্ডে এত মায়া এত ভালবাসা কাটান কি সহজ?

মা-হারা হরিণ-শিশুকে তাতঃ কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয়সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হ'য়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাতঃ কণ্ব ফিরলেন। দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটী বেঁধে দিলে, বলে দিলে—"দেখিস্‌, ভাই, যত্ন করে রাখিস।"

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাতঃ কণ্বকে প্রণাম করে, শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হ'য়ে পরের দেশে চলে গেল, বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখন মিথ্যা হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের সাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মত চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্ব্বাসার শাপে রাজার সেই আংটী শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল। আংটীর কথা মনেই পড়ল না।

রাজপুরে

দুর্ব্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাত মহল বাড়ি; তা'র এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে। প্রথম মহলে রাজসভা;—সেখানে সোণার থামে সোণার ছাত, তা'র তলায় সোণার সিংহাসন; সেখানে দোষী নির্দ্দোষের বিচার চলছে। তারপর দেবমন্দির;—সেখানে সোণার দেওয়ালে মানিকের পাখী, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা; মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড,—সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথি-শালা;—সেখানে সোণার থালায় দুসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে। তারপর নৃত্যশালা;—সেখানে নাচ চলছে, সানের উপর সোনার নুপুর রুণুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে। সঙ্গীতশালায় গান চলছে, অন্তঃপুরে সংসারের কাজ চলছে, উপবনে উৎসব চলছে। সোণার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে;—শকুন্তলার কথা তাঁ'র মনেই নাই। হায়, দুর্ব্বাসার শাপে সুখের অন্তঃপুরে সোণার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন ।

আর শকুন্তলা কত ঝড় বৃষ্টিতে—কত পথ চলে—রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—"কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কি চাও? টাকা কড়ি চাও,—না—ঘর বাড়ি চাও, কী চাও?'

শকুন্তলা বল্‌লে—"মহারাজ, আমি টাকাও চাই না, কড়িও চাই না, ঘর বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।"

রাজা বললেন—"ছি ছি, কন্যে, একি কথা! তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর বাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হ'তে চাও—এ কেমন কথা ?'

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—"মহারাজ, সে কি কথা? আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজ, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুন্ গুন্ গল্প করছিলুম এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলেম, তুমি হাসি মুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণ শিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বল্‌লে, কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল ,তুমি আদর করে বল্‌লে—'দুজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব'—শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তার পর, মহারাজ, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে বনে রইলে; বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে, কতদিন কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জ বনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে;—মহারাজ, সে কথা কি ভুলে গেলে? যাবার সময় তুমি, মহারাজ, আমার হাতে তোমার আংটী, পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোণার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোণার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?"

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণ-শিশুর কথা,—কত কথাই মনে করে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বল্‌লেন—"কই, কন্যে, দেখি তোমার সেই আংটী? তুমি যে বল্‌লে আমি তোমায় আংটী দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটী?" শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটী দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য,— রাজার সেই সাতরাজার ধন এক-মানিকের বরণ-আংটী কোথায় গেল! এতদিনে দুর্ব্বাসার শাপ ফল্‌লো। হায়, রাজাও তা'র পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না !

'মা-গো'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় সানের উপর ঘুরে পড়ল; তা'র কপাল ফুটে রক্ত ছুটল। রাজার সভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাচ্ছিল। হঠাৎ তা'র বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল; অমনি সে বিদ্যুতের মত মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একবারে হেমকূট পর্ব্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্ব্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্ত্তী রাজকুমার হ'ল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।

শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রূপলী রঙ্গের সরলপুটী, চাঁদের মত পায়রা-চাঁদা, সাপের মত বাণমাছ, দাঁড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁটাভরা বাটা, কত কি জালে পড়ল। সোণালি রূপলী মাছে নদীর পাড় মাছের ঝুড়ি যেন সোণায় রূপায় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাছ পড়ল তা'র ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল, জেলেরা জাল গুড়িয়ে ঘরে চল্‌লো।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কাল জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এ-পার ও-পার দু-পার জুড়ে জলে পরল। সেই সময় মাছের সর্দ্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী ঘেরা কাল জালে ধরা পড়ল। জেলে পাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দ্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙ্গায় উঠল। এত বড় মাছ কেউ কখন দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাত রাজার ধন এক-মানিকের আংটী জ্বলন্ত আগুণের মত ঠিক্‌রে পড়ল তখন সবাই অবাক্ হয়ে রইল। যা'র মাছ তা'র আনন্দের সীমা রইল না।

গরীব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটী সেকরার দোকানে বেচতে চল্‌লো।

রাজা শকুন্তলাকে যে আংটী দিয়েছিলেন—এ সেই আংটী, শচীতীর্থে গা-ধোবার সময় তা'র আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটী দেখে সেকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটী পেয়েছে নিবেদন করলে। রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যই আংটীতে মাছের গন্ধ, জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটী হাতে পড়্‌তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল। শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তা'কে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুঁষের আগুণে পুড়তে লাগল।

মুখে অন্য কথা নেই কেবল—'হা শকুন্তলা—হা শকুন্তলা'।

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নাই; রাজ-কার্য্যে সুখ নাই, অন্তঃপুরে সুখ নাই, উপবনে সুখ নাই, কোথাও সুখ নাই। সঙ্গীতশালায় গান বন্ধ হ'ল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হ'ল, উপবনে উৎসব বন্ধ হ'ল। রাজার দুঃখের সীমা রইল না। একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোণার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা রাজা দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কত দিন পরে দেবতার কৃপা হল। স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে, দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে ফিরছেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্ব্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চল্‌লেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস অনেক তপস্বিনী থাকতেন,অনেক অপ্সর অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত—শকুন্তলা আর তা'র পুত্র রাজপুত্র সর্ব্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁ'র সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীব জন্ত তাঁ'কে বড়ই ভালোবাসত। সেই বনে সাতক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তা'র তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত; এই গাছতলায় সর্ব্বদমনের রাজসভা বসত। হাতিরা তা'কে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তা'কে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত—এই তা'র রাজসিংহসন। দুদিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর ঢোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত; ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ ছিল চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল আর ছিল—শুক পাখী তা'র প্রিয়সখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ বিদেশের গল্প করত। সে পাখীর বাসায় পাখীর ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত,—কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালও বাস্‌ত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহ-শিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তা'র মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তা'কে কোলে পিঠে করছিল, তা'র জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটীর ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতে শুনছিল না। এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহ-শিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজ-শিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্ট শিশু রাজার কোলে শান্ত হ'ল। সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁ'রই পুত্র; ভাবছেন—পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল? এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন। রাজা রাণীতে দেখা হ'ল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁ'র কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হ'ল, দুর্ব্বাসার শাপান্ত হ'ল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজা রাণী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কত দিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে রাজা রাণী সেই তপোবনে তাতঃ কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণ-শিশুদের কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

সমাপ্ত।